শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা

আমরা কারা?

আবদুল মমিন চৌধুরী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা কারা?
(Who are we?)

আবদুল মমিন চৌধুরী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সভাপতি
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রণ
বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫ গ্রীনরোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৮২২-৮২৮৮৬৯

বাংলার ইতিহাস রচয়িতাদের দিক্‌পাল পরম শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায়ের একটি উক্তি দিয়েই আমার বক্তব্য শুরু করছি:

> ...ঐতিহাসিকও তো সামাজিক মানুষ: একটি বিশেষকালে একটি বিশেষ সমাজসংস্থার মধ্যে তাহার বাস। তাহার কাজ পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 'রাগদ্বেষবহির্ভূত হইয়া ভূতার্থ' বলা। কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে সেই ভূতার্থই তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক সমাজকে দেখিবার ও বুঝিবার যথাযথ দৃষ্টি ও বুদ্ধি দান করে এবং ভবিষ্যতের সমাজসংস্থা কল্পনা করিবার এবং গড়িবার প্রেরণা সঞ্চার করে। আবার, এই দৃষ্টি ও প্রেরণাই তাঁহাকে ভূত অর্থাৎ অতীত এবং ভূতার্থকে বুঝিতে, ধরিতে সাহায্য করে।[১]

ঐতিহাসিকের উপর্যুক্ত বক্তব্যে অনুপ্রাণিত-বহিঃপ্রকাশই আজকের এই সবিনয় প্রয়াস। বর্তমানের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার তাঁর *দি পাস্ট অ্যাজ্ প্রেজেন্ট* (২০১৪) গ্রন্থে খুব জোড়ালো যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, যদি বর্তমানকে যৌক্তিকভাবে বুঝতে অতীতকে আনা হয়, এবং তা আনা অবশ্যই প্রয়োজন, তাহলে অতীতকে নিগূঢ়ভাবে বিশ্লেষণ করে বর্তমানের সাথে সংশিষ্ট করতে হবে। অতীত ও বর্তমানের সংশ্লিষ্টতা অনুধাবন করতে অনেক সময়ই আমরা ভুলে যাই যে, বর্তমানের অনেক কিছুই অতীতের অর্জনের সূত্র ধরেই ইতিহাসের প্রবাহমান ধারায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ বর্তমানে আমরা 'ধর্ম'কে কেন্দ্র করে যে উন্মত্ততা ও অতীত সম্পর্কে অনীহা লক্ষ করছি, সেই সময়ে আমাদের ধর্মীয়-সামাজিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই দুই খ্যাতিমান ঐতিহাসিকের মন্তব্যকে ভর করেই আমার আজকের আলোচনায় অতীতে বাংলার মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করব। বাংলার প্রাচীন-মধ্য পর্বের ইতিহাসেই আমার আজীবন বিচরণ, তাই আজকের আলোচনাও আদিকাল থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখব। সুদূর অতীত অনেকের কাছেই তেমন সুস্পষ্ট নয়। অতীতের স্রোতধারাই সৃষ্টি করবে বর্তমানের ভাবধারা। অতীতের ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কৃতির সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাবেই হয়তো বিভ্রান্ত হচ্ছে বর্তমানের অনেক উপলব্ধি।

বাংলা পৃথিবীর দ্বিতীয় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, প্রথম ইন্দোনেশিয়া। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে ১৯৪৭-এ ভারত ভেঙ্গে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে এবং ১৯৭১-এ স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে।[২] এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই উপমহাদেশে 'ইসলাম' ধর্মের প্রসার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৭২-এর আদমশুমারি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, পশ্চিম এবং মধ্য (বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি এবং রাজশাহী ডিভিশনসমূহে অধিক সংখ্যক বহিরাগত

মুসলিমদের বসবাস ছিল; ২.০৬% উপর্যুক্ত তিনটি ডিভিশনে আর পূর্বাঞ্চলীয় ডিভিশনসমূহে বসবাস ছিল মাত্র ০.৮৯%, অর্থাৎ নিজেদের 'আশরাফ' বলে দাবি করে সমগ্র বঙ্গে ১.৫২%।[৩] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান। উপর্যুক্ত বিষয়টি অনুধাবন করে আবদুল করিম বাংলায় মুসলিম সমাজ গড়ে উঠতে সুলতান, উলামা ও মাশাইখদের ভূমিকার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[৪] ভাষার ক্ষেত্রে- কথ্য বা সাহিত্যে বহিরাগত বা স্থানীয়দের মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট ছিল। আশরাফ শ্রেণির বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ছিল।[৫] তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি হিন্দুয়ানি। অসীম রায় বাংলায় ইসলামিকরণকে 'Islamic Syncretistic tradition' বলে আখ্যায়িত করেছেন; বহিরাগত ধর্মের সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলেছেন।[৬] মমতাজুর রহমান তরফদার ইসলামের স্থানীয় রূপকে 'regional type of Islam' আখ্যা দিয়েছেন।[৭] বাংলায় ইসলাম ধর্মকে স্থানীয় অনেক ধর্ম-সাংস্কৃতিক উপাদানকে আত্মস্থ করতে হয়েছিল। বাংলার আদি হিন্দু-বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে তাদের আদি ধর্ম-সামাজিক রীতি-নীতিকে ধরে রেখে ইসলামকে গ্রহণ করতে হয়েছিল নিজের মতো করে। বাংলার ব্যক্তিত্বে এই দেওয়া-নেওয়াকে 'বৈতসী বৃত্তি' বলেছেন নীহাররঞ্জন রায়।

২

আমার আজকের বক্তৃতায় বাংলার মুসলমানদের নিয়ে পরষ্পর সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের অবতারণা ঘটবে। যেমন মুসলমানদের সামাজিক উত্থান (origin) থেকে সাম্প্রতিক কালে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন। যে প্রশ্নটি সামনে রেখে আলোচনার বহুমাত্রিক ধারণার বিশ্লেষণে প্রবেশ করবো, তা জটিল তো বটেই, অনেকটা এ বিষয়ে উত্তর খুঁজে বের করাও কঠিন। প্রশ্নটি খুবই ছোট: আমরা (বাঙ্গালি মুসলমান) কারা? উত্তর অনুসন্ধানে অনেক বিষয়ের আলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। যেমন ধর্মান্তকরণ ও ইসলামিকরণ (islamization), শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম-নিরপেক্ষ মনোভাব, পারস্পরিক ভাষা, একের ভেতর অন্যের অনুপ্রবেশ ও সংমিশ্রিত আচার ব্যবহার।

আমার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়টিতে বহুমাত্রিকতা তো রয়েছেই। এই যৌগিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয়গুলির খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণ সম্ভবত আমাদের পক্ষে উত্তর দেওয়ার পথ অনেকটা সহজ হবে মনে করেই আমি এগুতে প্রয়াস পাচ্ছি। হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে (জৈন ধর্মালম্বীদেরকে বাদ দেওয়া যায় না) পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্প্রীতি ভাবাপন্ন সমাজে ইসলামের আবির্ভাব কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও একথা মানতেই হবে যে, একসময় মুসলমান সম্প্রদায় বাংলা ভূখণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাড়ায়।

বাংলায় ইসলামের প্রসার সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতকের আশির দশকে; বিশেষত ১৮৭২-এর জনগণনা ও তার পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতে।[৮] এটি স্পষ্ট হয়

বর্ধমান বিভাগ বাদে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল ১ কোটি ৬১ লক্ষ, আর হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। বর্ধমান বিভাগসহ সর্বমোট হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮১ লক্ষ এবং মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ। ১৮৮১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, "কখন বাংলায় স্থানীয় জনগণের অর্ধেক ধর্মান্তরিত হয়? কেন তারা তাঁদের নিজস্ব ধর্ম ত্যাগ করে? কেন তাঁরা ইসলাম ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে? বাংলার ইতিহাসে এর চেয়ে গুরুভার প্রশ্ন আর জাগেনি।[৯] বঙ্কিম যথার্থই বলেছেন। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ১৮৭২-এর আদমশুমারির অধীক্ষক হেনরি বেভারলি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটি উপ-প্রমেয় (hypothesis) দাঁড় করিয়েছেন যে, সামাজিক অবস্থান, শারীরিক গঠন, আচরণ ও রীতিগত দিক দিয়ে মুসলিম এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়াকে ইসলামের সাফল্যের কারণ হিসেবে ধরেন।[১০] ১৮৯৫ সালে খন্দকার ফজলে রাব্বী তাঁর *The Origin of the Musalmans of Bengal*[১১] গ্রন্থ রচনা করে ইংরেজ গ্রন্থকারদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই অভিবাসী মুসলমানদের বংশধর। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজতে বহুমাত্রিক গবেষণা চলতে থাকে।

ফজলে রাব্বী যুক্তি দেখান, রিজলির কাছে বাংলার মুসলমানদের নমুনা হিসেবে উপাত্ত ছিল মাত্র ১৮৫ জন দরিদ্র মুসলমান যাদের অধিকাংশই ছিল জেলখানার আসামি। রিজলির নির্দেশনায় জরিপ থেকে উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণির মুসলিম জনগণকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, স্থানীয় জনগণের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বরঞ্চ মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুসলমানদের বাংলায় অভিবাসনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। তাঁরা প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল ধরে ভারতবর্ষের মুসলমান শাসকদের আহ্বানে এই উপমহাদেশে এসে মুসলিম শাসনকে দৃঢ় করেছে। তাঁদের অনেকেই বাংলায় এসে স্থায়ী বসবাস করেছেন। ফজলে রাব্বী মনে করেন, রিজলি অভিবাসীদের ভূমিকাকে তাঁর জরিপে ধরেননি ।

১৯২৭ সালে এক জরিপে পি.সি. মহলানবিশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাংলার মুসলিম জনগণ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সদৃশ।[১২] বি.এস. গুহ তাঁর গবেষণায় মহলানবিশের মত সমর্থন করেন।[১৩] ডি.এন. মজুমদার এবং সি. আর. রাও ১৯৪০-এ নৃতাত্ত্বিক জরিপে সেরোলজিক্যাল (serological) পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তাঁরা দুটি তথ্য প্রকাশ করেন: [১৪]

(ক) জাতিগতভাবে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতের বাইরের মুসলিম বা ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন।

(খ) বাংলার মুসলিমদের রক্তের গ্রুপ বাংলার মাহিষ্য ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমরূপ।[১৫]

আমি নিজেও বহুবছর আগে (১৯৮৩) বাংলার ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূল ছিল— এ বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখার চেষ্টা করেছিলাম।[১৬] মান্যবর আবু ইমাম তখন আমার প্রবন্ধটির আলোচনা করতে গিয়ে

লিখেছিলেন যে, মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি বিবেচনা করতে মধ্যযুগের বাংলার দিকে তাকাতে হবে। সেখানে লক্ষ্য করা যায় যে, উত্তর গাঙ্গেয় এলাকায় মুসলমানদের নয় বরং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতিপত্তি ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রভাব দেখা যায়, একই ভাবে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান তা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। *সেন্সাস অব বেঙ্গল, ১৮৭২* এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

সারণি ১: বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, ১৮৭২ সাল (বিভাগ অনুসারে)

বিভাগের নাম	মোট মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার বিচারে মুসলিম জনসংখ্যার হার	৫০০০ জনের বেশি বসতিপূর্ণ শহর নিবাসী মুসলিম জনসংখ্যার হার
বর্ধমান	৯,২৯,৩৯১	১২%	৩%
প্রেসিডেন্সি	৩,১৫৭,০২৬	৪৮%	১১%
রাজশাহী	৫,৪২০,৯৬০	৬০%	১.৭%
কোচ বিহার	১,৫১,২২৮	১৪%	০
ঢাকা	৫,৬২৭,৫২২	৫৯%	১.৮%
চট্টগ্রাম	২,৩২৩,০০৮	৬৬%	১.১%
বাংলা	১৭,৫০৯,১৪৫		৩.৫%

উৎস: *সেন্সাস অব বেঙ্গল*, ১৮৭২।

উপরের সারণিতে লক্ষণীয় যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম (দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলার) বিভাগদ্বয়ে মুসলিম জনসংখ্যার প্রবল আধিক্য এবং তাদের খুব কম সংখ্যাই শহরবাসী। এদের অধিকাংশ গ্রামবাসীই গ্রামীণ পেশায় নিয়োজিত, যেমন কৃষিকাজ, বয়নশিল্প, মৎসজীবী ও অন্যান্য ভূমি নির্ভর কার্যাবলিতে। বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর পেশার ধরন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মুসলিম জনগণই বহিরাগত নয়। "তাদের অধিকাংশই ছিল নিম্নবর্ণের কৃষক। শাসক গোষ্ঠীর বংশধরগণ কৃষক হবেন আর প্রজাদের বংশধরেরা সমাজের উচ্চ শ্রেণির অংশ হবে, এটি কল্পনা করাও অসম্ভব।"[১৭] আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, বহিরাগত মুসলমান বাংলায় ইসলাম বিস্তারে সহযোগী ভূমিকা পালন করে থাকলেও তারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখেননি। অর্থাৎ 'ধর্মান্তর' বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না।

একটি কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য সৃষ্টি হয়েছিল বেশ দীর্ঘ সময়ে। বাংলার মুসলিম শাসকরা প্রথম থেকেই দিল্লির মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন বা প্রকৃত বিদ্রোহীই হয়ে উঠেছিল। ফলে বাংলা *বলগাকপুর* (বিদ্রোহের নগরী) অভিধা অর্জন করেছিল। ১৩৩৮ (সাম্প্রতিক মুদ্রা প্রমাণে ১৩৩৩-৩৪) সালে স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার পর দিল্লির সাথে বৈরিতা বেড়েছিল এবং বাংলার সুলতানরা সবসময় তটস্থ থাকতেন। মধ্যপ্রাচ্য ও দিল্লি-পাঞ্জাব থেকে সৈনিকদের বাংলায় আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার সুলতানরা উপায়ন্তর না দেখে

স্থানীয় অমুসলিমদের সৈন্যদলে অর্ন্তভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম সৈন্যদলে যোগ দেওয়ায় তারা 'যবন দোষে' দুষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে তাদের জন্য ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। স্বাধীন সুলতানি আমলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সুলতানদের উদার মানসিকতা, সুফি-দরবেশদের শিক্ষা ও প্রণোদনা এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছিল। তাঁদের সাথে ছিল উলেমাগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করে এই নব্য-মুসলিম শ্রেণিকে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সাম্য ও মানবতার দিকগুলিকে সমাজে বিস্তার করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় সুফি-উলেমা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফলে বাংলায় ধর্মান্তকরণ কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল। আদি হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন জনগোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হয়েছিল এক দীর্ঘ সময়ের সামাজিক প্রক্রিয়ায়। এর কোন একটি বিশেষ কারণ নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। আকবর আলি খান প্রদত্ত বাংলার ৫১ জন পির-দরবেশের পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ:[১৮]

সারণি ২: বাংলার খ্যাতনামা ৫১ জন পিরের মাজারের কালানুক্রমিক তালিকা

সময় (শতাব্দী)	মাজারের সংখ্যা	শতকরা হার
ত্রয়োদশ শতাব্দী	১২	২৩.৪
চতুর্দশ শতাব্দী	২০	৩৯.৪
পঞ্চদশ শতাব্দী	১০	১৯.৯
ষোড়শ শতাব্দী	৭	১৩.৪
সপ্তদশ শতাব্দী	২	৩.৯

উৎস : আকবর আলী খান, *ডিসকভারি অব বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০০-১০৩।

এই সারণি ইঙ্গিত করে, শতকরা ৬২.৮ ভাগ পির ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় এসেছেন এবং এদের প্রভাবে বা মধ্যস্থতায় ধর্মান্তর প্রক্রিয়া বেগবান হয়েছে। তবে এ কথা অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, এ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে চলার পর এর ফল বোঝা যায়। উপরের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলায় ধর্মান্তরিতকরণ অন্তত চার শতাব্দী কাল ধরে চলেছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকগণনায় তা ধরা পড়লো।[১৯]

ধর্মান্তরিত মুসলিম জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে প্রশাসনের উচ্চপদসমূহ দখল করেছিল এমন দৃষ্টান্ত অজানা। রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তার পদগুলির অধিকাংশ অভিবাসী মুসলিম দখল করে ছিল; তবে যোগ্য হিন্দুদেরও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হতো। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্-এর রাজত্বকালে সুলতানের অমুসলিম কবি-সাহিত্যিক, সেনাধ্যক্ষ, রাজকর্মচারীদের সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[২০] অন্যান্য বেশ কয়েকজন সুলতানকে একই ধরনের সাম্য ও সৌহার্দের নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। ফলে সুলতানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও তাঁদের উদার মনোভাব ইসলাম বিস্তারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। সুফি-সাধকরা

সুলতানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তাঁদের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা সম্ভব হতো না।

বিশ্বনন্দিত পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটন বাংলায় ইসলাম বিস্তারের বিষয় নিয়ে নিবিড় গবেষণা করে তাঁর *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*[২১] গ্রন্থটি রচনা করেন এবং এ বিষয়ে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলপূর্বক ইসলামিকরণ মতবাদ, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা মতবাদ ও সামাজিক মুক্তির মতবাদসমূহকে অগ্রাহ্য করে সীমান্ত মতবাদের পক্ষে তাঁর অভিমত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮৭২-এর আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল মুসলিম শাসন কেন্দ্রসমূহে নয়, বরঞ্চ দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে, যেমন পূর্ব বাংলায়, পশ্চিম পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বেলুচিস্তানে। এসব এলাকাই শাসনকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে। এসব অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ইসলামের সম্মুখীন হওয়ার আগে হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজের সাথে তেমন নিবিড়ভাবে সমঝোতা গড়ে তুলতে পারেনি। মধ্য-বঙ্গ এবং পূর্ব-বঙ্গ ছিল এমন একটি এলাকা যেখানে আর্য সভ্যতা পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারেনি। সীমান্তবর্তী এলাকায় নব্য মুসলমানরা চাষাবাদের সব রকম সুবিধাদি লাভ করে এবং তাই এসব এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[২২] ইটন 'mass islamization' মোগল আমলে ঘটেছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৩] তা গ্রহণযোগ্য কি না পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বিষয়টি জটিলতো বটেই এবং সমসাময়িক দলিল দস্তাবেজে ইসলামিকরণ প্রত্যক্ষভাবে আলোচিত হয়নি। তাই নানান উপপ্রমেয় দাঁড় করিয়ে আধুনিক ইতিহাসবিদরা আমাদের মূল প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন। একটি বিষয় আমার কাছে নিশ্চিত বলে মনে হয়– স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মান্তকরণ মুসলিম সংখ্যাধিক্য সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। বহিরাগত অভিবাসীরা যোগ করেছিল ইসলামি সামাজিক রীতি-নীতি, সুফি-সাধকরা দীক্ষা দিয়েছিল ধর্মীয় আচার-ব্যবহার। ইসলামের উদারতা ও সাম্য ভাবনা আকৃষ্ট করেছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে। বাংলার নিম্ন বদ্বীপ এলাকায় উর্বরতা, চাষাবাদের সুবিধা জীবনযাত্রায় এনেছিল নিশ্চয়তা।

৩

আজ একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি বাংলার ভূভাগে প্রবেশ করার বহু পূর্বেই এখানকার জনগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা ও সভ্যতা সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'নরগোষ্ঠী' (রেইস্) শব্দটি প্রাণিবাচক (জুওলোজিক্যাল), সংস্কৃতিবাচক নয়। নরগোষ্ঠী বাস্তব, ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন ও পরিবেশের প্রভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি হয় 'জন' (পিপল), যে শব্দটি সাংস্কৃতিক, প্রাণিবাচক নয়। 'জন'-এর সূচনা থেকেই ইতিহাসের সূত্রপাত। বঙ্গা, রাঢ়া, পুণ্ড্রা; এদের নিয়েই বাঙালির ইতিহাসের শুরু। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে,

আর পরবর্তী দুই শতাব্দী কালব্যাপী গুপ্ত শাসনকালে তা দৃঢ় হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আগমন বাংলা ও বাঙালির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। দীর্ঘ পূর্বমুখী বিস্তারকালে (যা সময়ের দিক থেকে সহস্রাধিক বছর এবং দূরত্বের দিক থেকে সহস্রাধিক মাইল) ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি স্বাভাবিক কারণেই ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং ইত্যবসরে বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার ও বাংলার 'ব্যক্তিত্ব'তে নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

প্রাচীন বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্টতই ধরা পড়ে; আবার আদি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কারণেই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির শিথিলতা ও পরিমিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে যা কিছু বাংলার স্বকীয় বলে মনে হয় তা নিঃসন্দেহে আদি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রভাব বা বহিরাগত সাংস্কৃতিক প্রভাবের সাথে স্থানীয় আদি সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল। 'প্রোটোবেঙ্গলি' লিপির উদ্ভব, দুর্গা দেবীর প্রতি বাংলার বিশেষ আকর্ষণ, তান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, জীমূতবাহন কর্তৃক নিবন্ধিকৃত বাংলার বিশেষ উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতির কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এসব বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি বাংলার স্বকীয়তার কথাই ঘোষণা করে।

আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পশ্চিম বাংলার রাঢ়, গৌড় ও পুণ্ড্রের পশ্চিমাঞ্চলে অনেকটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গ-সমতট-হরিকেলে সেই সংস্কৃতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক ক্ষীণ। তাই ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজ জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্মে অনেক উদার চিন্তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। উভয় ধর্মকেই প্রাচীন বাংলার জনগণ নিজের আদি মানসিকতা দিয়ে সিক্ত করে গ্রহণ করেছে। সে কারণেই হয়তো প্রাচীন বাংলার 'ব্যক্তিত্বে' ধর্মীয় মনোভাবে গোঁড়ামীর অভাব ও সাম্য ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এই কারণেই হয়তো উদারভাবাপন্ন বৌদ্ধ ধর্মকে বাংলা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মের উদার সাম্যবোধ আর বাংলার ব্যক্তিত্বে মানবতার প্রতি গভীর অনুরাগ একই তরঙ্গে প্রবাহিত হয়েছিল বলেই হয়তো বৌদ্ধ ধর্ম উপমহাদেশের এই পূর্বাঞ্চলীয় ভূভাগেই অধিক অনুসারী পেয়েছিল। অবশ্য দীর্ঘকাল সনাতনী ধর্মের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এবং আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধধর্মের আদিরূপও বাংলায় বেশিদিন টিকে থাকেনি। ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রতি যে বিরোধ ছিল, ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে উঠেছে। বিরোধের উগ্রতা প্রশমিত হয়ে সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। যেসব বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং যা প্রত্যাখ্যান করে গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন, মনে হয় বাংলায় শেষ পর্যন্ত সেই বৌদ্ধাদর্শ তারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এ পরিবর্তনকেই বাংলার

বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান ও তন্ত্রযান বা সহজযান ও কালচক্রযান নামে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলার বৌদ্ধধর্মের এই লোকজ সংস্কৃতি সম্ভবত আদি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কারণেই ঘটেছিল। বাংলার 'সাঙ্গিকরণ'-এর প্রবণতা থেকেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের এই রূপান্তর। নবাগত প্রবাহে গা না ভাসিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা সমন্বয় গড়ে তোলাই বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। নীহাররঞ্জন রায়ের উদ্ধৃতি দিয়েই প্রাচীন বাংলার ব্যক্তিত্বে ধর্মীয়-সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াসের সমাপ্তি টানছি:[২৪]

> আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; সনাতনত্বের প্রতি বিরাগ যে বাংলার ঐতিহ্য ধারায়। ... বাঙালির বৃত্তি যথার্থ বৈতসী; যে আদর্শ যে ভাবস্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙালি তখন বেতস লতার মতো নুইয়া পড়িয়া অনিবার্যবোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মতো করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া; নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তি বাঙালিকে বারবার বাঁচাইয়াছে।

বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় এবং বলা হয়, বাঙালি তার দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে এমন এক সামাজিক আচার-আচরণের ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। আধুনিক জ্ঞানকাঠামোয় যা 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ' (Religious Pluralism) ধারণাটির প্রায় কাছাকাছি বা সমার্থক। তাই 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ' ধারণাটি স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানে ধর্মীয় চরম উগ্রতার বিপরীতেই 'বহুত্ববাদ' ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। সাদামাটাভাবে 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ'কে সংজ্ঞায়িত করা হয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও সহাবস্থান বোঝানোর জন্য। 'বহুত্ববাদ' ধারণাটি প্রাচীন গ্রিকদের চিন্তা-চেতনায় প্রথম দেখা যায়। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও জেনোফোন গ্রিক, মিশরীয় ও পারস্যের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপসংহার টেনেছিলেন যে, শতাব্দীকাল ধরে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছিল বিভিন্ন জাতি, ধর্ম বিশ্বাস, ভাষা ও সংস্কৃতি ধারণকারী মানবগোষ্ঠীর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। ধারণাটি আরো স্পষ্ট করা প্রয়োজন: (ক) 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ' ধারণাটিতে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে কোন একটি ধর্মই সত্যের একক ও বিশিষ্ট উৎস নয়; অন্য ধর্মগুলোতেও সত্য ও মূল্যবোধ রয়েছে; (খ) অনেক সময় একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি করাকে বোঝায়, যা ইংরেজি ভাষায় 'ecumenism'; (গ) প্রত্যয়টি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সহিষ্ণুতা ধর্মীয় সহাবস্থানেরই পূর্ব শর্ত। ইউরোপীয় দার্শনিক হব্‌স তাঁর *লেভিয়াথানে* এই মর্মে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, সমাজে শান্তি বিরাজ করবে কেবল ঐ সময়ে যখন একটি মাত্র ধর্ম বিদ্যমান থাকবে। ১৬৮৯ সনে জন লক তাঁর 'লেটার কনসার্নিং টলারেশন'-এ হব্‌সের

বিরোধিতা করে ধর্মীয় বহুত্ববাদের ধারণা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি রাষ্ট্র ও চার্চের ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্নতা তুলে ধরে বলেন রাষ্ট্র নাগরিকদের বৈচিত্র্যকে রক্ষা করবে এবং নাগরিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে চার্চ অবশ্যই নাগরিক সমাজের অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল হবে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে। আঠার শতকের ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত যুগের দার্শনিকবৃন্দ ধর্মীয় সংঘাতের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, রাষ্ট্র ও চার্চ- উভয়কেই সহনশীল হতে হবে।

এতক্ষণ 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ'কে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টায় যে ব্যাখ্যাসমূহ উপস্থাপন করলাম সেগুলোকে একত্রিত করে প্রত্যয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা নিশ্চয় করা সম্ভব: বর্জন নয় বরং গ্রহণ করার মনোভাব; সহযোগিতা ও বিবিধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমঝোতার উন্নয়ন ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সহাবস্থান। যেহেতু ধর্ম একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়, ফলে দীর্ঘসময় ধরে 'বহুত্ববাদ'-এর অবস্থিতি নৈকট্য থেকে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। তবে এ ধরণের ব্যতিক্রম 'বহুত্ববাদ'-এর ধারণার বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং এর যথার্থতাই প্রমাণ করে।

ধর্মীয় বহুত্ববাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর বাঙালির সহস্রাধিক বছরের ইতিহাসের আদিপর্বের দিকে পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেব। এটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য যে, বাংলার জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনধারায় ব্রাহ্মণ্য-পূর্ব বিশ্বাসের সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্মীকরণ ঘটেছিল এবং স্থানীয় স্বকীয়তা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন, বাংলার মানুষের চেতনায় গভীর ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যপূর্ব বিশ্বাস ও রীতি-নীতির ফলে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্ম একটি বিশেষ বাঙালি চরিত্র গ্রহণ করেছে। অতীতের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আগত নতুনকে গ্রহণ করেই বাঙালি তার ইতিহাসের বহু ধাপ অতিক্রম করেছে। এই পরিক্রমায় আমরা বিরোধ লক্ষ করি না, বরং 'বহুত্ববাদ'-এর ধারণাকে সমুন্নত রেখে সহযোগিতা ও সহাবস্থান-এর উপস্থিতিকেই দেখতে পাই।

আদিকাল থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালপর্বে বাঙালির ধর্মীয়-সামাজিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের কাছে উপর্যুক্ত ধারণাই প্রতীয়মান হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থানই বাংলার প্রাচীন যুগের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে বৌদ্ধ শাসকদের সহনশীল মনোভাব 'ধমীয় বহুত্ববাদ'- এরই বহিঃপ্রকাশ। একথা এখন প্রায় সবাই স্বীকার করে যে, বাংলার সভ্যতার ভিত্তি কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনধারা থেকেই গড়ে উঠেছিল। অস্ট্রিক ভাষা ব্যবহারকারী 'নিষদ'দের দ্বারা। অনেকদিন থেকেই একথা প্রচলিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার আগমনের পরই বাংলায় উচ্চতর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। কিন্তু বিগত ষাট বছরে বাংলার ভূ-ভাগে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার একথা প্রমাণ করেছে যে প্রথম সহস্র খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই, বা তার কিছু আগে থেকেই, বাংলার মানুষ

বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক বা আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনায় বেশ অগ্রসর ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বহু আগে থেকেই বাংলায় মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণ্য মতবাদ সমূহের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব মতবাদ এবং বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ বাংলায় প্রসার লাভ করেছিল। এদের মধ্যে কোন কোন মতবাদ এক এক সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন মতবাদের সহাবস্থান তো প্রায় সব সময়ই লক্ষ করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুর প্রতি যে বাঙালির বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্যারি মরিসন তাঁর *পলিটিক্যাল সেন্টারস্ এন্ড কালচারাল রিজিয়ন্স* (১৯৭০) গ্রন্থে পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাপ্ত ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রশাসনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাংলার উত্তর, মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলে অধিকাংশ দান বিষ্ণু মন্দির বা প্রতিষ্ঠান পেয়েছে। মরিসন তাই অনুমান করেছেন, বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলে বিষ্ণুর আরাধনাই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ শাসকগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। দান গ্রহীতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণির। বাংলায় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসনকর্তারা প্রায় সবই ছিল বৌদ্ধ, কিন্তু তাদের উদার-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন বাঙালির মানবতার প্রতি গভীর আকর্ষণই হয়তো তাদের করেছে বিষ্ণুপ্রিয়। এই মানবতাবোধ থেকেই গড়ে উঠেছে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মনোভাব, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি। বাঙালির এই ধর্মীয়-সামাজিক আচরণ একদিকে যেমন ধর্মীয় বহুত্ববাদের অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানবতার প্রতি আকর্ষণের কথাই প্রমাণ করে। তাই আমরা মধ্যযুগীয় কবি চণ্ডিদাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি:

শোন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীন বাঙালির মানবতার প্রতি গভীর আকর্ষণ সপ্রশংস ভাষায় উল্লেখ করেছেন: "প্রাচীন বাংলার ধর্মকর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে এ মানবিক আবেদন যতটা বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট, সেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের প্রতিও অনুরাগ যেভাবে ধরা পড়িয়াছে, এমন আর কোথাও যেন নয়।"[২৫] এ মানবতার প্রতি আদি পর্বের বাঙালির আকর্ষণ ও জীবনদর্শনই মধ্যপর্বের বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। উদার সাম্য ভাবনা ও মানবতার আদর্শই প্রাচীন বাঙালির ধর্ম-সামাজিক সংস্কৃতির গৌরব আর শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম, উত্তরাধিকার। আজকের বাঙালিও যে এই উত্তরাধিকারের ঐতিহ্য বহন করে– এ কথা বর্তমানের প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ঐতিহ্য যে কত গৌরবের, কত মহত্ত্বের তা তাঁদের উপলব্ধিতে সদাজাগ্রত রাখাও একান্ত প্রয়োজন।

এবার বাংলার ইতিহাস থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে উপরের বক্তব্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব। পালবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপালকে তাঁর পুত্র দেবপালের তাম্রশাসনে তাঁকে 'শাস্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন' বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন বর্ণ যাতে নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থাকে সেদিকে তিনি তৎপর ছিলেন বলে উলেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পাল শাসক তৃতীয় বিগ্রহপাল সম্পর্কে বলা হয়েছে '*চর্তুবর্ণ-সমাশ্রয়*'। বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ কর্তৃক হিন্দু মন্দির ও ব্রাহ্মণদের জন্য ভূমিদানের মাধ্যমে ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রসারের এবং অনুসরণের দৃষ্টান্ত এত অসংখ্য যে তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বেদ পড়ে শুনানোর জন্য ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করছে; আর এ ভূমিদানের ফলে মাতা-পিতার ও নিজের পূণ্য সাধন হবে– এরূপ বিশ্বাসের অভিপ্রকাশ ঘটেছে অসংখ্য তাম্রশাসনে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসকদের অসংখ্য তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ বংশলতিকা এবং ভূমিদান অংশ লক্ষ করলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে শাসকগোষ্ঠী ছিল বৌদ্ধ (যারা প্রায় চারশ' বছর একাধারে শাসন করেছিল) কিন্তু বেশিরভাগ রাজ কবি, প্রশস্তি রচয়িতা, মন্ত্রীবর্গ এবং বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ ছিল সনাতনী ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ শাসকদের প্রশস্তিতে পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তির বহুল ব্যবহার এ কথাই প্রমাণ করে যে ধর্মীয় বিভেদের কোন চিহ্নই ছিল না বলা চলে। ধর্মীয় সহাবস্থানের এবং সমন্বয়ের এর চাইতে আর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত কি হতে পারে।

অপর একটি বস্তুগত দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায় পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের কেন্দ্রীয় ক্রসাকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উদঘাটিত ধ্বংসাবশেষের নিচ থেকে দ্বিতীয় স্তরের বর্হিদেয়ালে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত দেখা যায়। স্থাপত্যটি বৌদ্ধরাজা (ধর্মপাল) কর্তৃক নির্মিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পোড়ামাটির ফলকে বিধৃত রয়েছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের এর চাইতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি যে স্থানে নির্মিত হয়েছিল, একই স্থানে এর আগে একটি জৈন মন্দির ছিল, যার কিছু প্রমাণ নিচের বা আদিস্তরে বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাতে এক সময় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মদ্বয়ের পাশাপাশি অবস্থান ছিল তার উল্লেখ যুয়ান জাং (৬৩২ খ্রি.)-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তেই উল্লেখ রয়েছে।

এ ছাড়াও যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার ভোজগতি ইউনিয়নে দোনার গ্রামে দমদম পীরস্থান নামে প্রত্নস্থলটি খনন করে যে সব ধ্বংসাবশেষ উৎঘাটিত হয়েছে তা একাধিক ধর্মীয় স্থাপনা তো বটেই এবং একটি স্থাপনাতে বেলেপাথরের তির্থঙ্কর (খুব সম্ভবতঃ মল্লিনাথ)-এর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই আবিষ্কার থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান যে, এ প্রত্নস্থলে একটি জৈন মন্দির ছিল। একই স্থানে একটি গণেশ মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এসব প্রমাণাদি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সহাবস্থানই প্রমাণ করে। তবে মনে রাখতে হবে যে জৈন ধর্মের অবস্থান বেশিদিন হয়তো বাংলায় টিকে থাকেনি। তবে

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈনদের সহাবস্থান বাংলার ধর্ম সংস্কৃতিতে বিদ্বেষ নয়, সহনশীলতা ও সহাবস্থানেরই প্রমাণ বহন করে।

৪

বৌদ্ধ ও সনাতনী ধর্মের দীর্ঘকাল ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে এই দুই ধর্মের সংমিশ্রিত রূপ তান্ত্রিক দর্শনের উদ্ভবের মধ্যে লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে অসহিষ্ণুতা যে একেবারেই ছিল না তা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে আছে, ‘পরধর্ম ভয়াবহ’। আবার এও প্রচারিত হতে দেখা যায় যে হিন্দু ধর্ম সহিষ্ণু। এ দুই অবস্থানের মধ্যে স্ববিরোধ অবশ্যই আছে। সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বৌদ্ধ রাজশক্তির শাসনের সময়ও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। কৌম সমাজ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবেই রূপান্তরিত হয়েছিল, তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। তার বিরোধিতা করেই অংশত ও সাময়িকভাবে সফল হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্ম। আবার এই দুই ধর্মের সমঝোতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল তান্ত্রিক মতবাদের।

সেন যুগের ব্রাহ্মণ্য পুনর্জ্জীবন আর বৌদ্ধদের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রকাশ বাংলার ধর্ম-সামাজিক সংস্কৃতিতে কেমন যেন হঠাৎ করে আসা তাণ্ডব। দীর্ঘকাল ধরে লালিত সহিষ্ণুতার মানসিকতায় এ যেন এক অপঘাত। এই অপঘাতের প্রতি বিরোধী মতবাদ ফুটে উঠতে দেখছি সরোজবজ্রের *দোহাকোষে*। *দোহাকোষে* প্রাপ্ত কয়েকটি উদাহরণ বাংলায় উদার মনোভাব আর গোঁড়ামির প্রতি বিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায়: (ক) হোমাগ্নি মুক্তি প্রদান করে কিনা, কেউ জানে না, তবে তার ধুঁয়া চোখে নিশ্চিতভাবে পীড়াদায়ক; (খ) যদি নগ্নতা (বৌদ্ধ ও জৈন ক্ষপনক সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত) মুক্তি প্রদান করতে পারে, তবে কুকুর শৃগাল মুক্তি পাবে সবার আগে; (গ) বলা হয়ে থাকে যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের জন্ম। কিন্তু তাতে কি? আজকাল তাদের জন্ম অন্য সবার মতোই। তাহলে তাদের উচ্চতর অবস্থানের কারন কি? (ঘ) যদি এ কথা স্বীকার করা হয় যে, ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন ‘সংস্কারের’ ফলে উচ্চতর স্থান অর্জন করে, তাহলে আমি বলবো চণ্ডালদের ঐসব ‘সংস্কার’ পালন করতে দেয়া হোক যাতে তারা ব্রাহ্মণ হতে পারে। তোমরা বলো যে, *বেদ*-এর জ্ঞান তাদের ব্রাহ্মণ করে, তাহলে চণ্ডালকে *বেদ* পড়তে দাও। এ সব প্রতিবাদী উচ্চারণ সেনপর্বে ব্রাহ্মণ্য পুনর্জ্জীবনের অপঘাতের প্রতিক্রিয়া।

সহিষ্ণুতা ও সাম্যভাবনা প্রসূত ‘ধর্মীয় বহুত্ববাদ’-এর ধারণা যে প্রাচীন বাংলার অতি প্রশংসনীয় ঐতিহ্য সে বিষয়ে নিশ্চয় এতক্ষণের আলোচনা আমাদেরকে সচেতন করবে। অতীতের উত্তরাধিকার ভবিষ্যতে পথচলার দিক নির্দেশনা দেবে। অতীতকে অবলম্বন করেই আগামীর প্রস্তাবনা সৃষ্টি করতে হবে, আর এই প্রস্তাবনাকে ধারণ করেই ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে সমাজদেহে যতদিন জীবনী শক্তি থাকে ততদিন ভিতর থেকে বা বাহিরে থেকে যত আঘাতই আসুক না কেন সমাজ আপন শক্তিতেই তা প্রতিরোধ করবে। সমাজ এ শক্তি পাবে তার অতীতের ঐতিহ্য থেকে। অতীতের উত্তরাধিকার সম্পর্কে গভীর সচেতনতাই

সৃষ্টি করবে এ প্রাণশক্তি। ধর্মীয় উগ্রতার উদীয়মান শক্তিকে প্রতিহত করতে প্রয়োজন অতীতের উত্তরাধিকার সচেতনতা সমৃদ্ধ দৃঢ় আত্মোপলব্ধি।

এখন আমার মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। অষ্ট্রিক-নিষদের কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এই কৌম সমাজে ধর্মের বীজ বপন করেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের ঘাত-প্রতিঘাত জন্ম দিয়েছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে। কিন্তু এদের মধ্যে সংঘাতের কোন দৃষ্টান্ত নেই, বরঞ্চ রয়েছে সহাবস্থান ও সহযোগিতার দৃষ্টান্ত। ধর্মীয় বহুত্ববাদের বৈশিষ্ট্যাবলি অঙ্গে ধারন করেই বাংলার মানুষ উপস্থিত হয়েছে ইসলামের সাম্য ও সমতার; এতো বাঙালির ব্যক্তিত্বে দীর্ঘকালের উত্তরাধিকার। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনেই বাংলার জনগণের সাথে সাংঘর্ষিক ভূমিকা গ্রহণ না করে সৌহার্দের নীতি গ্রহণ করেছে। আর মুসলিম সুফিদের প্রচারণায় তা ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার গ্রামাঞ্চলে। এই পরিবেশের যে ধর্মান্তর ঘটবেই তা স্বাভাবিক।

তাই আমরা একাধারে বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমান, পাশাপাশি অবস্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীর সাথে স্বাভাবিক কারণেই বা ঐতিহ্যগত কারণেই সদ্ভাব গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনগোষ্ঠীর অভিবাসন বাংলার সংস্কৃতিতে এক নতুন ও ভিন্নতর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। বাংলার সংস্কৃতি উচ্চতর মান অর্জন করেছে। তাই আজকের আমরা বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আর ইসলামের সাম্য ভাবনার বাহক। উগ্র ধর্মীয় মনোভাব আমাদের ঐতিহ্যের বাইরে এবং উপনিবেশিক শাসনামলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতা ক্ষণস্থায়ী এবং এক উগ্র শ্রেণির হাতিয়ার হিসেবে সময়ে সময়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। বক্তৃতার সমাপ্তি টানতে চাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে,

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,-
শক-হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান

টীকা ও তথ্যসূত্র

---

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দেজ পাবলিকেশন, কোলকাতা: ৭২৩-২৪।

২. বর্তমানের স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং ভারত রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ (১৯৪৭-এর বেঙ্গল প্রদেশ) এই বিশাল ভূভাগ যথার্থভাবেই ভৌগোলিকদের Region বা Cultural Region সুদিপ্ত অধিকারীর ভাষায়, India present a mosaic of cultural regions (*Fundamentals of Geographical Thoughts*, 4th edition, Allahabad, 2006)

৩. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims: A quest for Identity*, Delhi: Oxford University Press, 1981: 17.

৪ . Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538)*, Chittagong: Baitush Sharif Islamic Research Center, Chapter IV to VI: 62-238.

৫. Salimullah Khan, 'Beyond Equivalence: Introduction to Tahmid Zami', in Tahmid Zami, *Universalism and Polyglossia in Bengali Sufi c. 1550-1700*, Dhaka: University of Liberal Arts, 2016: 17.

৬. Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, 1983: 243.

৭. M.R. Tarafdar, 'The Bengali Muslims in the Pre-colonial Period: Problems of Conversion, Class Formation and Cultural Evolution, Pursartha, No, 9, Paris, 1986: 93-110.

৮. H. Beverly, *Census of Bengal 1872*, Calcutta, 1872: 12-15.

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১: ৩৪০।

১০. *Census of Bengal 1872*, Calcutta, 1872: 132.

১১. Khandakar Fazle Rabbi, *The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895.

১২. P.C. Mahalanabis, *Analysis of Race Mixture in Bengal*, Oxford, 1944.

১৩. B.S. Guha, *Race Elements of Bengal*, Calcutta, 1960

১৪. *প্রাগুক্ত* : ৯৬-৯৮.

১৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আকবর আলি খান, 'বাংলায় ইসলামের প্রসার: ঐতিহাসিক বিষয়াদির পুনর্বিবেচনা', অবদুল মমিন চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস: সুলতানি ও মোগল যুগ (আনু, ১২০০-১৮০০ সা. অব্দ)*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০: ২৫৫।

১৬. 'Conversion to Islam in Bengal: An Exploration' in Rafiuddin Ahmed (ed.), *Islam in Bangladesh: Society, Culture and Politics*, Dhaka: Bangladesh History Association, 1983: 10-26.

১৭. *বঙ্কিম রচনাবলি*, ১৯৯১: ৩৪০।

১৮. *ডিসকভারি অব বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৬: ১০০-১০৩।

১৯. Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Dhaka, 1983: 23-25.

২০. অবদুল মমিন চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস: সুলতানি ও মোগল যুগ (আনু, ১২০০-১৮০০ সা. অব্দ)*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০: ২৫৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

২১. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, Delhi: Oxford University Press, 1994.

২২. *প্রাগুক্ত*: ১১৩-১৩৪.

২৩. *প্রাগুক্ত*: ১১৩-২২৭।

২৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দেজ পাবলিকেশন, কোলকাতা: ৭১৩।

২৫. *প্রাগুক্ত*: ৭১৬।